হযরত ইমাম মাহদী (আ)-এর জীবদ্দশায় প্রথম ও শেষ সালানা জলসা

মাওলানা জাফর আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ

১৮৯১ সালে প্রথম জলসা:

হযরত মসীহ মাওউদ (আ) তাঁর পুস্তক "আসমানী ফয়সালা" তে আঞ্জুমানের কাজের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার জন্য জামা'তের সদস্যগণকে দিক-নির্দেশনা দেন যে, তারা যেন ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে চলে আসেন। সুতরাং নির্ধারিত সেই তারিখে জামা'তের সদস্যগণ মসজিদে আকসা কাদিয়ানে উপস্থিত হোন। যোহরের নামাযের পরে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

জলসার প্রারম্ভে মৌলানা আব্দুল করিম শিয়ালকুটি সাহেব হযরত আকদাসের নতুন পুস্তক আসমানী ফয়সালা পাঠ করে শোনান। এরপর যারা যারা আঞ্জুমানের সদস্য, তাদের নিকট প্রস্তাব আহবান করা হয়, কিভাবে এই কার্যক্রম আরম্ভ করা যায়। সকল সদস্য এক বাক্যে বলেন,যত দ্রুত সম্ভব এই পুস্তক প্রকাশ করা উচিত। সেই সাথে বিরুদ্ধবাদীদের ঠিকানা সংগ্রহ করে আঞ্জুমানের সদস্যদের মনোনীত করে তাদের নিকট তা শ্রবন করানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এরপর জলসা সমাপ্ত হয় এবং জলসায় আগত মেহমানগণ হযরত আকদাসের সাথে মুসাফা করেন। এটি জামাতে আহমদীয়ার সর্বপ্রথম সম্মেলন বা প্রথম সালানা জলসা ছিল। এই জলসায় নিম্নবর্ণিত ৭৫ জন আহমদী অংশগ্রহণ করেন।

১) মুন্সি মোহাম্মদ অরোড়া সাহেব, কপুরথলা, ২) মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সাহেব, কপুরথলা, ৩) মুন্সি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব কপুরথলা, ৪) মুন্সি মোহাম্মদ জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা, ৫) মুন্সি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন সাহেব, লাহোর, ৬) মুন্সি মোহাম্মদ খান সাহেব, কপুরথলা, ৭) মুন্সি মোহাম্মদ সারওয়ার খান সাহেব, কপুরথলা, ৮) মুন্সি ইমদাদ আলী সাহেব, কপুরথলা, ৯) মৌলবী মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব, কপুরথলা, ১০) হাফেজ মোহাম্মদ আলী সাহেব, কপুরথলা, ১১) মির্যা খোদা বকস সাহেব, নবাব মালইয়ার কোটলা, ১২) মুন্সি রুস্তম আলী সাহেব, লাহোর, ১৩) ডিপুটি হাজী ফাতাহ আলী সাহেব, লাহোর, ১৪) হাজী খাজা মোহাম্মদ উদ্দিন সাহেব, লাহোর, ১৫) মিয়া মোহাম্মদ চিটু সাহেব, লাহোর, ১৬) মুন্সি তাজউদ্দিন সাহেব, লাহোর, ১৭) মুন্সি নবী বকস সাহেব, লাহোর, ১৮) হাফেজ ফজল আহমদ সাহেব,লাহোর, ১৯) মৌলবী রহিম উল্লাহ সাহেব, লাহোর, ২০) মৌলবী গোলাম হোসেন সাহেব, লাহোর, ২১) মুন্সি আব্দুর রহমান সাহেব, লাহোর, ২২) মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব, মসজিদ চিনইয়া, ২৩) মুন্সি করম ইলাহী সাহেব, লাহোর, ২৪) সৈয়দ নাসের শাহ সাহেব, লাহোর, ২৫) হাফেজ মোহাম্মদ আকবর সাহেব, লাহোর, ২৬) মৌলবী গোলাম কাদের সাহেব, শিয়ালকোর্ট, ২৭) মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব, শিয়ালকোর্ট, ২৮) মীর হামেদ শাহ সাহেব, শিয়ালকোট, ২৯) খলিফা রজব উদ্দিন সাহেব, লাহোর, ৩০) মুন্সি মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব, শিয়ালকোট, ৩১) হাকিম ফজলুদ্দীন সাহেব, শিয়ালকোট, ভেরা, ৩২) মিয়া নাজিমুদ্দীন সাহেব, শিয়ালকোট, ভেরা, ৩৩) মুন্সি আহমদ উল্লাহ সাহেব, জমুন, ৩৪) সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ সাহেব, জমুন, ৩৫) মিস্ত্রি ওমর উদ্দিন সাহেব, জমুন , ৩৬) মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব, জমুন, ৩৭) খলিফা নুরুদ্দীন সাহেব, জমুন, ৩৮) কাজী মোহাম্মদ আকবর সাহেব, জমুন, ৩৯) শেখ মোহাম্মদ জান সাহেব, উযিরাবাদ, ৪০) মৌলবী আব্দুল কাদের সাহেব, জামালপুর, ৪১) শেখ রহমত উল্লাহ সাহেব, গুজরাট,

৪২) শেখ আব্দুর রহমান বি.এ সাহেব, ৪৩) মুন্সি গোলাম আকবর সাহেব, লাহোর, ৪৪) মুন্সি দোস্ত মোহাম্মদ সার্জেন্ট সাহেব, জমুন, ৪৫) মুফতী ফজলুর রহমান সাহেব, জমুন, ৪৬) মুন্সি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, লাহোর, ৪৭) শের শাহ সাহেব, জমুন, ৪৮) সাহেবজাদা ইফতিখার আহমদ সাহেব, লুধিয়ানা, ৪৯) কাজী খাজা আলী সাহেব, লুধিয়ানা, ৫০) হাফেজ নুর আহমদ সাহেব, লুধিয়ানা, ৫১) শাহজাদা হাজী আব্দুল মজিদ সাহেব, লুধিয়ানা, ৫২) হাজী আব্দুর রহমান সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৩) শেখ শাহাবুদ্দিন সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৪) মীর মাহমুদ শাহ সাহেব, শিয়ালকোট, ৫৫) হাজী নিযাম উদ্দিন সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৬) শেখ আব্দুল হক সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৭) মৌলবী মাহকুম উদ্দিন সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৮) শেখ নুর আহমদ সাহেব, অমৃতসর, ৫৯) মুন্সি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, ৬০) মিয়া জামালুদ্দিন সাহেব, শেখওয়াল, ৬১) মিয়া ইমামুদ্দিন সাহেব শেখওয়াল, ৬২) মিয়া খায়রুদ্দিন সাহেব, শেখওয়াল, ৬৩) মিয়া মোহাম্মদ ঈসা সাহেব, নওশহর, ৬৪) মিয়া চেরাগ আলী সাহেব, সাকিনথ গোলামনবী, ৬৫) শেখ শাহাবুদ্দিন সাহেব, সাকিনথ গোলামনবী, ৬৬) মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব, সাকিন সোহল, ৬৭) হাফেজ আব্দুর রহমান সাহেব, সাকিন সোহিয়া, ৬৮) দারোগা নেয়ামত আলী সাহেব, বাটালবী, ৬৯) হাফেজ হামেদ আলী সাহেব, বাটালবী, ৭০) হাকিম জান মোহাম্মদ সাহেব, ইমাম মসজিদ কাদিয়ান, ৭১) বাবু আলী মোহাম্মদ সাহেব, জমিদার বাটালা, ৭২) মির্যা ইসমাঈল বেগ সাহেব, কাদিয়ানী, ৭৩) মিয়া বুড্ডা খাঁ নম্বরদার সাহেব, বেইরী, ৭৪) মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেব, জমিদার পিট্টি, ৭৫) শেখ মোহাম্মদ ওমর সাহেব, বাটালা।

হযরত আকদাস (আ) ১৮৯১ সালে জলসার অব্যবহিত পরেই ইস্তেহারের মাধ্যমে জামা'তের সদস্যদেরকে সংবাদ দেন যে আগামী বছর থেকে প্রতি বছর ২৭,২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর তারিখে জামা'তে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে।

সালানা জলসা কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে:

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে ১৮৯২ সাল ছাড়া অন্যান্য জলসা মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। [১৮৯২ সালের জলসা ঢাপের পাড়ে অনুষ্ঠিত হয়]। খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রা.) র খেলাফতকালীন প্রথম পাঁচ বছর সালানা জলসা মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সালানা জলসা নুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে জলসায় লোকের আধিক্যের কারণে সে বছর কল্যানমন্ডিত সালানা জলসা নুর মসজিদের বাহিরে সামনের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মোট ২২ টি জলসা এ মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের জলসা মসজিদে আকসাতেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে বাবে আনোয়ারের পুরাতন জলসা গাহে জলসা সিফট করা হয়। সুতরাং কাদিয়ানের সালানা জলসা সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের তত্বাবধানে লাহোরে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮ সালের সালানা জলসা ডিসেম্বর মাসের পরিবর্তে ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে রাবওয়ায় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর নিয়মিত সালানা জলসা রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর ইংল্যান্ডে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়াও প্রতিবছর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এ জলসার আদলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই, যেখানে আহমদীয়া জামা'ত আছে, প্রতিবছর তাদের দেশীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং নিজেদের আধ্যাত্বিক উন্নতি সাধন।

সালানা জলসার গোড়াপত্তন বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়। কেননা, হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া সমগ্র দেশে বিরোধীতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। লাহোরের চিনইয়ান নামক মসজিদের ইমাম মৌলবী রহিম বখস সাহেব অত্যন্ত জোরে-শোরে এই ফতওয়া দেয়, এ ধরনের জলসায় যোগদান করা কেবল বেদাতই নয় বরং পাপ হবে। শুধু ধর্মীয় বিরোধীতা নয় বরং আর্থিক সংকটের কারণেও এই জলসা বাহ্যিক দৃষ্টিতে চালু রাখা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি পদে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) কে অদৃশ্য থেকে সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। লেখা দীর্ঘায়িত হওয়ার কথা চিন্তা করে এখানে কেবল দু' একটি ঘটনা পাঠকগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি। কপুরথলার মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব বর্ননা করেন, একবার সালানা জলসার সময় জিনিসপত্র ছিল না। সে যুগে সালানা জলসার জন্য চাঁদা জমা করা হত না বা উঠানো হত না। হুযূর (আ.) নিজের পক্ষ থেকেই ব্যয় নির্বাহ করতেন।

একবার মরহুম নাসের নবাব সাহেব এসে আবেদন করেন, মেহমানদের রাতে খাবারের জন্য কোন কিছু নেই। তিনি (আ.) বলেন ঘরে বিবি সাহেবার কাছ থেকে কোন অলংকার নিয়ে তা বিক্রি করে ব্যবস্থা কর।

সুতরাং মীর সাহেব অলংকার বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে মেহমানদের জন্য খাবারের জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। দুই দিন পরে মীর সাহেব পুনরায় উপস্থিত হয়ে বলেন, আগামীকালের জন্য খাবার কোন কিছু নেই। এ কথা শ্রবন করে হযরত আকদাস বলেন, আমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জাগতিক জিনিসপত্র দ্বারা যতটুকু ব্যবস্থা করার ছিল তা করেছি। এখন আর কিছু করার নেই, যার মেহমান তিনিই ব্যবস্থা করবেন। পরের দিন সকাল ৮/৯ টার সময় যখন ডাক পিয়ন আসে, তো হুযূর আমাকে এবং মীর সাহেবকে ডেকে পাঠান। আমরা গিয়ে দেখলাম ডাক পিয়নের হাতে ১০/১৫ টি মানি অর্ডার যা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে। আর এগুলোতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ও একশত একশত টাকার মানিঅর্ডার রয়েছে। মানিঅর্ডার গুলোতে লেখা আছে, আমরা যেহেতু স্ব-শরীরে উপস্থিত হতে পারিনি, তাই মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য এ টাকা পাঠানো হলো। হযরত আকদাস টাকা রিসিভ করে আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করার ওপর বলেন, কোন জাগতিক লোকের নিজ সিন্দুকে গচ্ছিত টাকার প্রতি তার ভরসা থাকে অর্থাৎ যখন খুশি সে তা বের করতে পারবে । যারা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, তারা এর থেকেও বেশী নিশ্চিত থাকে। তাদের সাথে এরূপই হয়। যখনই তাদের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, আল্লাহ্ দ্রুত তার ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেন।

১৯০৭ সালের সালানা জলসা

১৯০৭ সালের সালানা জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলসা। কেননা এটি হযরত ইমাম মাহদী (আ) র জীবনের শেষ জলসা।

মেহমানগণের আগমন: ১৯০৭ সালের সালানা জলসার উদ্দেশ্যে লোকেরা ১৯

ডিসেম্বর থেকেই আসতে আরম্ভ করে। দুই একজন বন্ধু এর পূর্বেও দারুল আমানে পৌঁছান। কিন্তু সবার আগে দো আলমিয়াল জামাত তাদের আমীর মৌলবী করম দাদ সাহেবের নেতৃত্বে কাদিয়ান পৌঁছান। এরপর দেশের চার দিক থেকে জলসার উদ্দেশ্যে অসংখ্য মেহমান আসতে আরম্ভ করে। ২৪ ডিসেম্বর এবং এরপর শিয়ালকোট, জমুন, ওযিরাবাদ, গুজরানওয়ালা, জেহলম, গুজরাত, লাহোর, অমৃতসর, কপুরথলা, লুধিয়ানা ,জলন্ধর, দিল্লি এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জামা'ত সমূহ এসে পৌঁছায়। ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বরও অনেক বড় সংখ্যায় মেহমান আসেন।

২৫ ডিসেম্বর তাশহীযুল আযহানের জলসা:

২৫ ডিসেম্বর যোহরের নামাযের পর তাশহীযুল আযহানের একটি সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলাওয়াতের পরে হাফেজ আব্দুল করিম সাহেব বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন। এরপর সাহেবজাদা মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব তৎকালীন যুগের অবস্থা তুলে ধরে যুবকদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সৈয়দ ওলীউল্লাহ শাহ সাহেব (যিনি তখন তালীমুল ইসলামের ছাত্র ছিলেন) নিজের প্রবন্ধ পাঠ করেন। আকবর শাহ খান সাহেব ও নিয়ামত উল্লাহ সাহেব, উভয়ে নযম পাঠ করে শুনান। সবশেষে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব 'প্রচারকের বৈশিষ্ট কিরূপ হওয়া উচিত'-এ ব্যপারে আলোচনা করেন। প্রচারককে পবিত্র হতে হবে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২৬ ডিসেম্বর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রাত:ভ্রমণের সময় ঈমান উদ্দিপক ঘটনা:

হযরত আকদাস ২৬ ডিসেম্বর সকালে প্রাত:ভ্রমনে বাহিরে বের হোন। খোদ্দামরা অতি উৎসাহের সাথে হযরতের সাথে সাক্ষাতের জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এতবেশী লোক সমাগম ছিল যে প্রাত:ভ্রমনে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। হযরত আকদাস গ্রামের বাহিরে একটি গাছের নীচে দাড়িঁয়ে যান। আর সেখানে খোদ্দামদের সাথে প্রায় দুই ঘন্টা মসাফা করেন। সেই সময়ের দৃশ্য দেখার মত ছিল। সবাই চাচ্ছিল আমি সবার আগে যাব আর হযরতের সাথে সবার আগে সাক্ষাত করব। একজন গ্রামের লোক আরেকজনকে বলছে এ ভিড়ের মধ্যে জোর করে সামনে গিয়ে সাক্ষাত কর। আর এটা করতে গিয়ে যদি শরীর টুকরো টুকরোও হয়ে যায় তবুও তোয়াক্কা করবে না। যোহর ও আসরের নামায মসজিদে আকসায় আদায় করা হয়। নামাযের পরে মৌলানা নুরুদ্দিন সাহেব নিকাহর এলান করান। বিবাহের খুতবায় নিকাহর উদ্দেশ্যের ওপর একটি তাত্বিক বক্তব্য রাখেন। বিবাহের পরে মীর কাসেম আলী সাহেব একটি কল্যানমন্ডিত নযম পাঠ করেন।

২৭ ডিসেম্বর হযরত আকদাসের প্রথম বক্তব্য: ২৭ ডিসেম্বর মসজিদে আকসায় জুমুআর নামায আদায় করা হয়। জুমআর সময় মসজিদে আকসার ভিতর ও বাহির কানায় কানায় ভরে যায়। খোদ্দামরা আশপাশের দোকান ও বাড়িঘরের ছাদে এবং ডাক বিভাগের ছাদে জুমআর নামায আদায় করে। সামগ্রিক উপস্থিতি ছিল তিন হাজারের মত। হযরত মৌলবী নুরুদ্দিন সাহেব জুমআর খুতবা পড়ান। জুমুআর নামাযের সাথে আসরের নামাযও জমা করে আদায় করা হয়। অত:পর হযরত আকদাস খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে হৃদয়-স্পর্শি বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর তাঁর বক্তব্যে সূরা ফাতিহার সূক্ষ্ম তফসির বর্ননা করার পর জামা'তকে আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

তিনি বলেন, আত্মশুদ্ধি সেটাকে বলে যে ব্যক্তি সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের অধিকার আদায়কারী হবে। আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে যেভাবে আমরা মুখে ওয়াদা করি তার কোন শরিক নাই। অনুরূপভাবে তা যেন আমাদের আমল দ্বারাও প্রকাশ পায়। সৃষ্টিকে যেন তাঁর সমতুল্য কখনো মনে করা না হয় বা তাঁর সমকক্ষ দাড় করানো না হয়। সৃষ্টির অধিকার হচ্ছে কোনভাবেই যেন কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকে। নি:সন্দেহে খোদার অধিকার অনেক বড়, কিন্তু খোদার অধিকার আদায় হচ্ছে কি-না, তা বুঝার জন্য বান্দার অধিকার আদায় করাও জরুরী। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে না, সে খোদার নিকট পরিস্কার থাকতে পারে না। হুযূর (আ.) বলেন :

দেখ, হযরত রসূলে করীম (সা) এর জামা'ত অসংখ্য বিজয় লাভ করেছে। এর কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে, তারা একদেহ একপ্রাণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র ঘর সেটাকে বলা যাবে না, যেখানে প্রতিমা থাকে। আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে খোদার ঘর। কিন্তু সেটাকে কেবল তখনই খোদার ঘর বলা যাবে, ফেরেশতা কেবল তখনই সেখানে প্রবেশ করবে, যখন মানুষের হৃদয় পরিস্কার হবে, পুত:পবিত্র হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় পরিস্কার হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল সঠিক হতে পারে না। এখন উপযুক্ত সময়, যা কাজ করার করে নাও। কোথাও যেন এরূপ না হয় যে জাগতিকভাবেও বিরোধীতার সম্মুখীন হচ্ছ, আবার ধর্মও সঠিকভাবে পালন না করার কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। কে জানে কখন কার ডাক আসবে। মৃত্যু তো সর্বদা লেগেই রয়েছে, তাই বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে চেষ্টা কর। বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে জামাতের সদস্যগণ হুযূরের সাথে মুসাফা করেন।

২৮ ডিসেম্বর হুযূরের ভ্রমন: ২৮ ডিসেম্বর হুযূর তার নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী প্রাত:ভ্রমণে বের হন। সেদিন জামাতের অনেক বড় সংখ্যা হুযূরের সাথে ছিলেন। ডা: ইয়াকুব বেগ সাহেব,চৌধুরী মাওলা বকস সাহেব, মালিক মোহাম্মদ হায়াত সাহেব, হাকিম মোহাম্মদ ওমর সাহেব এবং ডা: খলিফা রশিদ উদ্দিন সাহেব এত ভাল ব্যবস্থা করেন যে, জামাতের সকল সদস্যগণ হুযূরের সাথে খুব ভালভাবে আরামের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আকদাস মাঠের একপাশে বসেন প্রথমে অমৃত সরের এক বন্ধু এবং পরে আবু ইউসূফ মৌলবী মোবারক আলী সাহেবদ্বয় নযম পাঠ করে শুনান।

হযরত আকদাস (আ.)-এর দ্বিতীয় বক্তব্য: এ দিন মসজিদে আকসায় যোহর ও আসরের নামায জমা হয়। এরপর হযরত আকদাস দ্বিতীয় বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের প্রারম্ভে হুযূর বলেন, "আমি গতকাল যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, তার মাঝে কিছুটা অংশ বাকী রয়ে গেছে। কেননা শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে তা শেষ করতে পারিনি, তাই আজ আবার আরম্ভ করছি। কেননা মানব জীবনের কোন গ্যারান্টি নেই। যারা আজ এখানে উপস্থিত আছেন, জানিনা আগামী বছর কারা জীবিত থাকবেন আর কারা মৃত্যুবরণ করবেন। হুযূরের এই হৃদয়-স্পর্শি ও হৃদয়কে চুর্ণ-বিচুর্ণকারী কথার পরে নিজ খোদ্দামদের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ধৈর্য্য ধারন করার কথা বলেন। এ ছাড়াও তিনি তাদেরকে আরো মূল্যবান নসিহত করেন। তার (আ.) এ মর্মস্পর্শি ও চিন্তার খোরাক বক্তব্য যে বাক্য দ্বারা সমাপ্ত

করেন, তা হচ্ছে, "প্রথমে কি একথা বলা হয় নাই যে, শেষ যুগে একটি শিঙ্গায় আকাশ থেকে ফু দেয়া হবে। সেটা কি খোদার ধ্বনী নয়? নবীগণ যখন আসেন, তখন তারা শিঙ্গায় ফুৎকার দেন। শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার এটাই অর্থ ছিল, তখন একজন প্রত্যাদিষ্টকে প্রেরণ করা হয়। তিনি তোমাদেরকে অবগত করবেন, এখন তোমাদের সময় এসে গেছে। কে কাকে সংশোধন করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাকে সংশোধন না করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার নবীদেরকে এক প্রকার সুপ্ত-শক্তি দান করেন, যেন মানুষের হৃদয় তাঁর দিকে ঝুকে। আল্লাহ্‌র কাজ কখনো বিনষ্ট হয় না। একটি অলৌকিক শক্তি এ কাজ করে দেখাবে। এখন সেই সময় এসে গেছে, নবীগণ প্রথম থেকেই যার সু-সংবাদ দিয়ে আসছেন। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের সময় নিকটবর্তী, সেটাকে ভয় কর এবং তওবা কর। (বদর ১৪ জানুয়ারী ১৯০৮)

সদর আঞ্জুমানের সভা: সেই দিন ২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে মাগরিবের নামাযের পরে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর দুরান্ত থেকে আগত অধিকাংশ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণ সেই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেক্রেটারী সাহেবগণ বিভিন্ন বিভাগের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এরপর ১৯০৮ সালের বাজেট উপস্থাপন করা হয়। খাজা কামালুদ্দিন সাহেব বাজেট পেশ করার পরে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ের ওপর সামগ্রিক আলোচনা করেন। এরপর মৌলবী নুরুদ্দিন সাহেব তার বক্তব্যে কুরআন করীমে কি ধরনের আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা উল্লেখ করেন। তাঁর (রা.) বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কুরআন করীম হচ্ছে জ্ঞানের একটি সমুদ্র, এর মাঝে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় বর্নিত রয়েছে।

বয়আত:

জলসার দিনগুলোতে বয়আতের ধারা অব্যাহত থাকে। কখনো বয়আতকারীর সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে, মানুষের জন্য হযরত আকদাসের নিকট পৌঁছানো এবং নিয়ম অনুযায়ী হাতে হাত রেখে বয়াত করা অসম্ভব হয়ে যেত। এ কারণে লোকেরা নিজেদের পাগড়ী খুলে বিভিন্ন দিক থেকে হযরত আকদাসের দিকে নিক্ষেপ করত। এমন কি অনেকে একটি পাগড়ী আরেকটি পাগড়ীর সাথে বেঁধে দুর দুরান্ত থেকে ছুড়ে দিতেন। এক মাথায় বয়াতকারী ধরে রাখতেন আর অপর প্রান্তে যারা হুযূরের হাতে হাত দিয়ে বয়াত করতেন তারা ধরে রাখতেন। যারা সরাসরি হুযূরের হাতে হাত দিয়ে বয়াত করতে পারতেন না, তারা পাগড়ীর মাথা ধরে বয়আত করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এভাবে লোকেরা অনেক বড় সংখ্যায় বয়াত করার জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগীতা করতেন। এভাবে পাগড়ীর মাধ্যমে হযরত আকদাস ও বয়াতকারীর মাঝে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হত। বয়আতের সময় যেহেতু হযরত আকদাসের কথা দুর পর্যন্ত পৌঁছাতো না, তাই কিছু দুরে দুরে একজন করে খোদ্দাম দাঁড়ানো ছিল, যারা হযরত আকদাসের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতেন। এভাবে তারা বয়াতের কথাগুলো বয়াতকারী পর্যন্ত পৌঁছাতেন।

লঙ্গরখানার ব্যবস্থা এবং ইতয়ামুল জা'য়ে ওয়াল মু'তাবের এলহাম:

শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব,হাকীম ফজলুদ্দিন সাহেব, মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব,কাজী আমীর হোসেন সাহেব ও মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং ছাত্ররা সেচ্ছাসেবক হিসাবে অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে মেহমানদের খাবার খাওয়ান। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ধারনার তুলনায় অনেক বেশী মেহমান উপস্থিত হয়। একদিন তো এমন হল যে যৌক্তিক কারণে বেশ কয়েকজন মেহমান অনেক দেরীতে রাতের খাবার পান। আবার অনেক মেহমান খাবারের দেরী দেখে না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই শুয়ে পড়েন। তারা না কারো কাছে কোন অভিযোগ করেছেন আর না সহানুভূতি লাভের আশায় কারো কাছে তা বর্ননা করেছেন। তাদের ধৈর্য্য ধারন করা এবং কারো কাছে বর্ণনা না করার কারণে আরশের খোদা নিজে ফেরেশতা দ্বারা ইলহাম করেন, "ইতয়ামুল জা'য়েউ ওয়াল মু'তাবের" অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ও অসহায়দের খাবার খাওয়াও। এ ইলহামের পর হুযূর (আ.) সকাল সকাল খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন, কতিপয় মেহমান রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছেন। হুযূর (আ.) তখনই ব্যবস্থাপনাকে ডাকেন এবং তাদের তাকিদ করেন যেন মেহমানদেরকে ভালভাবে আদর আপ্যায়ন করা হয়, কারো যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

১৯০৭ সালের কয়েকজন সনামধন্য সাহাবী হচ্ছেন : ১) চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.), ২) হাজী আবু বক্কর ইউসূফ সাহেব (রা.), ৩) শেখ নিয়ায মোহাম্মদ সাহেব (রা.) [ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ]

[সংকলন: তারিখে আহমদীয়াত, ১ম ও ২য় খন্ড]

"ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁর সাথে মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে খোদার আদেশ লংঘন করে সে কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)